সংবাদ পরিষেবা | এপ্রিল ২০২৩

কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক, এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম-ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

## প্রাকৃতিক চাষে এগিয়ে চলেছে অন্ধ্রপ্রদেশ

২৮/৫৬

২০১৬ সাল থেকে অন্ধ্রপ্রদেশে কমিউনিটি ম্যানেজড ন্যাচারাল ফার্মিং (APCNF) কর্মসূচির অধীনে ১০০ শতাংশ রাসায়নিকমুক্ত চাষের কাজ চলছে। এই রাজ্যে প্রায় ৬০ লক্ষ চাষি রয়েছে, এর মধ্যে ৬ লক্ষ ৩০ হাজার চাষি এই কাজে যুক্ত হয়েছে।

ইউনিভার্সিটি অব রিডিং, ইউনাইটেড কিংডম এবং রাইথু সাদিকারা সংস্থার এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রচলিত চাষের তুলনায় এই পদ্ধতিতে চাষের উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতায় কোনো তারতম্য ঘটেনি। কিছু ক্ষেত্রে উৎপাদন বেড়েছে।

প্রচলিত চাষে প্রচুর রাসায়নিক কীটনাশক এবং সার ব্যবহার হয়। এর ক্ষতিকর এবং অর্থনৈতিক প্রভাবে, বহু চাষি এই রাজ্যে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল। বলা যায়, চাষিদের আত্মহত্যায় বরাবর প্রথম সারিতে থাকত এই রাজ্য। এর বিকল্প হিসেবে যে জৈব চাষের প্রসারের কথা বলা হয়, তাতেও জৈব উপকরণের জন্য বাজারের ওপরই নির্ভর ছিল চাষিরা। ফলে তাদের খরচের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছিল। এরই ফলস্বরূপ জিরো বাজেট ন্যাচরাল ফার্মিং (বা শূন্য খরচের প্রাকৃতিক চাষ)-এর আদলে কমিউনিটি ম্যানেজড ন্যাচারাল ফার্মিং শুরু করা হয়।

উল্লেখ্য, এই পদ্ধতির চাষে কোনো কৃত্রিম কীটনাশক বা সার ব্যবহার করা হয় না। বাজার থেকে কোনো জৈব সার কেনাও হয় না। চাষিদের হাতের কাছে থাকা গোবর, গোমূত্র, গাছপালা, পাতা থেকে চাষিরা নিজেরাই সার, কীটরোধক তৈরি করে ব্যবহার করে। ফলে শ্রম বেশি লাগলেও চাষের উপকরণের জন্য টাকা পয়সার খরচ করতে হয় না। **অ্যাগ্রোনমি ফর সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট জার্নালে** প্রকাশিত এই সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই চাষে ফসলের উৎপাদন কমে না। অন্যদিকে ফসলের পুষ্টিগুণও অক্ষত থাকে। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, রাসায়নিক চাষে উৎপাদিত ফসলের পুষ্টিগুণ বজায় থাকে না।

গবেষকরা ২০১৯-২০ সালের জুন মাস থেকে তিনটি মরশুমে ২৮ টি খামারে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। খামারগুলি রাজ্যের অনন্তপুর, কাদাপ্পা, কৃষ্ণা, নেলোর, প্রকাশম এবং বিশাখাপত্তনম জেলা জুড়ে বিভিন্ন কৃষি জলবায়ু অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল।

সমীক্ষা প্রতিবেদনে অনুমান করা হয়েছে যে, যদি এই রাজ্যের মোট উৎপাদিত ফসলের ২৫ শতাংশ ফসল, শূন্য খরচের প্রাকৃতিক চাষের মাধ্যমে উৎপাদিত হয়, তবে প্রতি বছর রাসায়নিক সারে ভরতুকি না দেওয়ার জন্য সরকারের ৫৭৫ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে।

রাসায়নিক সারের ব্যবহারে চাষিদের অর্থের অপচয় হয়, স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। এছাড়া গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন, জীব বৈচিত্রের ক্ষতি এবং পরিবেশ দূষণ তো হয়ই। কিন্তু প্রাকৃতিক চাষে এইসব ঝুঁকি একেবারেই কমিয়ে ফেলা যায় বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

## সহায়ক মূল্য আর খাদ্য নিরাপত্তার পদক্ষেপ ২৮/৫৭

উৎপাদিত ফসল সংগ্রহ ও তার জন্য সহায়ক মূল্য দিতে এবং খাদ্য নিরাপত্তা আইন অনুযায়ী খাদ্য পৌঁছে দিতে কেন্দ্রীয় সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছে তা হল —

- ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে খাদ্যশস্য সংগ্রহের সরকারি নীতি তৈরি হয়েছে। সেই নীতি অনুসারে নির্দিষ্ট মান ও শ্রেণি অনুযায়ী সরকারি সংস্থাগুলি শস্য কিনে থাকে।
- বীজ বোনার আগেই ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা করা হচ্ছে, যাতে চাষিরা কোন শস্য চাষ করবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
- সরকার প্রতি বছর খাদ্য শস্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাড়াচ্ছে, যাতে কৃষি উৎপাদন চাষিদের কাছে লাভজনক হয়।
- আগে থেকেই ফসলের মান ও শ্রেণি এবং বিক্রিসহ এরসঙ্গে সম্পর্কীত যাবতীয় বিষয়ে চাষিদের জানানো হচ্ছে। এর ফলে তারা নির্দিষ্ট মান অনুসারে তাদের ফসল উৎপাদন করতে পারছে। আর বাজারে গুণমান সম্পন্ন ফসল বিক্রির জন্য আনতে পারছে।
- ফসল সংগ্রহের জন্য ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া (এফসিআই) সহ সংগ্রহকারী সংস্থাগুলি যথেষ্ট সংখ্যক সংগ্রহ কেন্দ্র খোলে। এছাড়া চলতি মান্ডি এবং ডিপো/গোডাউনের পাশাপাশি বহু সাময়িক ক্রয় কেন্দ্রও খোলা হয় চাষিদের জন্য।
- ২০২১-২২ রবি বিপণন মরশুম থেকে সারা দেশে 'ওয়ান নেশন ওয়ান এমএসপি থ্রু ডিবিটি' বা এক দেশ এক সহায়ক মূল্য এবং দাম সরাসরি চাষির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানোর ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এতে চাষিদের অ্যাকাউন্টে টাকা সরাসরি পৌঁছানো নিশ্চিত করা হয়েছে। এর ফলে ভুয়ো চাষিরা বাদ গেছে। অর্থের অপচয় কমেছে।
- এফসিআই এবং বেশিরভাগ রাজ্য সরকার তাদের নিজস্ব অনলাইন সংগ্রহ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। এর ফলে চাষি এবং ফসলের নথিকরণ এবং প্রকৃত সংগ্রহ স্বচ্ছতার সঙ্গে হচ্ছে।
- ফুড কর্পোরেশন অব ইডিয়া বিভিন্ন কর্মসূচিতে বিতরণের জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে খাদ্যশস্য দিয়ে থাকে। ভারত সরকার দেশের জনগণকে খাদ্য নিরাপত্তা দিতে বরাদ্দ স্থির করে থাকে।
- সরকার জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন ২০১৩ রূপায়ণ করছে। এই আইনের আওতায় গ্রামীণ জনসংখ্যার ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত এবং শহরের জনসংখ্যা ৫০ শতাংশ পর্যন্ত খাদ্যশস্য পাচ্ছে বিনামূল্যে। এতে ২০১১-এর জনগণনা অনুযায়ী দেশের জনসংখ্যার তিন ভাগের দুই ভাগ বা ৮১.৩৫ কোটি মানুষ খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় চলে এসেছে। আইনটি রূপায়িত হচ্ছে সবকটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে। উল্লেখ করা ৮১.৩৫ কোটির মধ্যে ৮০.১১ কোটি মানুষ বর্তমানে খাদ্য পাচ্ছে।

এসব সরকারি ভাষ্য। আমরা জানি সরকারের কথার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষজনের অভিজ্ঞতার বিস্তর ফারাক। যেমন সরকার বলছে, প্রতি বছর সহায়ক মূল্য বাড়ানো হয়। এটা ঠিক, তবে এর ফলে চাষিদের সত্যি অর্থে আয় বাড়ে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। অন্যদিকে খাদ্য নিরাপত্তা মানে কি শুধুই কার্বোহাইড্রেড-এর নিরাপত্তা? নাকি এর সঙ্গে প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিনসহ অন্য খাদ্যেরও নিরাপত্তা বোঝায়! এসব প্রশ্নের উত্তর সরকারের কাছে নেই।

## বাড়িতেই সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ২৮/৫৮

রুফটপ সোলার স্কিম বা ছাদে সৌরশক্তি উৎপাদন প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের আওতায় এ বছর ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যগুলিতে ৩,৩৭৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে, বসত বাড়ির ছাদে ৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। ৩,৩৭৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ২,৯১৭ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে ৪ লক্ষ ৩০ হাজার মানুষ উপকৃত হবে বলে সরকার মনে করে।

পশ্চিমবঙ্গে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা ২০ কোটি টাকার মধ্যে ১০ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। আসামে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যেই ০.২ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষম

ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছে। ত্রিপুরা এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের জন্য ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সংসদের বাজেট অধিবেশনে এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে ও তথ্য জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ এবং নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রী আর কে সিং।

## তেলতেলে উদ্যোগ ২৮/৫৯

খাবার তেলের সহজলভ্যতা বাড়াতে এবং আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনতে, ভারত সরকার ২০১৮-১৯ থেকে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা মিশন - তেলবীজ (এনএফএসএম-ওএস) রূপায়ণ করছে। এজন্য বাদাম, সয়াবিন, রেপসিড এবং সরষে, সূর্যমুখী, সাফোলা, তিল, ক্যাস্টর প্রকৃতি তেলবীজের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি দেশে তেলবীজ উৎপাদন এলাকার প্রসার ঘটানো হচ্ছে।

এছাড়াও ২০২১-২২ এ কেন্দ্রীয় যোজনা হিসেবে ভোজ্য তেল এবং পাম তেল নিয়ে জাতীয় মিশন (এনএমইও-ওপি) চালু করা হয়েছে। এর পাশাপাশি পাম তেল উৎপাদনের জন্য চাষের প্রসার ঘটানো হয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং আন্দামান-নিকোবরের ওপর বিশেষ লক্ষ্য দিয়ে ভোজ্য তেলের ক্ষেত্রে দেশকে আত্মনির্ভর করে তুলতে, পাম তেল চাষের এলাকা ৩.৭০ লক্ষ হেক্টর থেকে বাড়িয়ে ২০২৫-২৬ সালে ১০ লক্ষ হেক্টর করা হবে। ২০২২-২৩-এ ১৫টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত এলাকায় এই প্রকল্প রূপায়ণ করা হচ্ছে।

জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা মিশন-তেলবীজ (এনএফএসএম-ওএস)-এর অধীন ভারত সরকার বিশেষ কিছু প্রকল্প রূপায়ণ করছে। রেপসিড এবং অন্যান্য তেলবীজের উন্নত এবং উৎপাদনক্ষম বীজের বিতরণ বাড়ানো হয়েছে। আগামী ২০২৪-২৫ সালের মধ্যে হাইব্রিড সরষে বীজ এবং সূর্যমুখীর উৎপাদন এলাকা বাড়াতে দেশজুড়ে ৩ বছরের একটি সময়সীমা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এর পাশাপাশি সরকার ধান কাটার পর সেই জমিতে সূর্যমুখী চাষের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে।

## ২০৩০ এর মধ্যে ৫০০ গিগাটন সবুজ শক্তি ২৮/৬০

কনফারেন্স অব দ্য পার্টিস (বা কপ-২৬)-এর প্রতি ভারতের দায়বদ্ধতার কারণে কেন্দ্রীয় সরকার বাতাসে কার্বন নির্গমনের মাত্রা হ্রাস করতে বদ্ধপরিকর। এজন্য আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ গিগাওয়াট অ-জীবাশ্ম (পেট্রোলিয়াম বা কয়লা জাতীয় জ্বালানি নয় এমন) জ্বালানি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের লক্ষ্যে ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশনের গ্রিন এনার্জি লিমিটেড বা এনটিপিসি এনজিইএল সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এই কোম্পানির কাজের ফলে পরিবেশ-বান্ধব জ্বালানি উৎপাদনে ভারত কতটা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তার বার্তা পৌঁছে যাবে দেশের কাছে বলে মনে করে কেন্দ্রীয় সরকার। গ্রিন এনার্জি বা সবুজ শক্তি উৎপাদনের চিরাচরিত উৎসগুলির ওপর নির্ভরশীলতা কমবে। আর পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন প্রকল্পগুলির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হবে বলে মনে করছে সরকার।

## বাঁধের জন্য নদীর ক্ষতি ২৮/৬১

পৃথিবীর উপরিভাগে সবচেয়ে বড় বৈচিত্র হল নদীর সীমানায়। তবে কয়েক দশক ধরে এই সীমানার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। ওই পরিবর্তনের কারণ কী? তা বোঝার জন্য, চাইনিজ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেসের নানজিং ইনস্টিটিউট অফ জিওগ্রাফি অ্যান্ড লিমনোলজির অধ্যাপক সং চুন কিয়াওর নেতৃত্বে একটি গবেষণা হয়েছে। বিশ্বজুড়ে তারা চার দশক ধরে হয়ে চলা নদীগুলির সীমানার পরিবর্তন বিশ্লেষণ করেছেন ল্যান্ডস্যাট চিত্রের সাহায্যে।
কয়েক দশক ধরে স্থানীয় ভিত্তিতে নদীর সীমার পরিবর্তনের সংখ্যা নির্ধারণ এবং ব্যাখ্যা করার জন্য, গবেষকরা দুটি প্রধান

অত্যাধুনিক সারফেস ওয়াটার ডাটাবেস, সারফেস ওয়াটার এবং ওশান টপোগ্রাফি রিভার ডেটাবেস থেকে তথ্য ব্যবহার করেছেন। ফলাফলে দেখা গেছে, বিশ্বব্যাপী নদীর প্রায় ২০ শতাংশ এলাকা দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে। এই ধরনের নদী অববাহিকায়, নদীর নাগালের বিভিন্ন পাশ বরাবর কিছুটা সংকুচিত এবং কিছুটা প্রসস্ত হয়েছে। বিশ্বজুড়ে নদীতে বাঁধ নির্মাণ এজন্য দায়ী বলে এই গবেষণায় দাবী করা হয়েছে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনও নদীর সীমানা পরিবর্তনের জন্য দায়ী বলে তারা দাবী করেছেন।

## তাল তাল সমস্যা দূর করে তিল

২৮/৬২

তিলের নাড়ু খেতে পছন্দ করেন কম বেশি সবাই। ইদানিং অনেক স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ স্যালাডেও ভাজা তিলের ব্যবহার করছেন। শরীরের নানা রোগব্যাধি দূর করতে তিল তেলও বেশ উপকারী। কিন্তু বাঙালি রান্নায় খুব বেশি তিলের তেল ব্যবহার করা হয় না। এই তেল যেমন স্বাস্থ্যের জন্য উপকারি, তেমনি রান্নায় এই তেলের ব্যবহার করলে তার স্বাদও বেড়ে যায় কয়েক গুণ।

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাদা তিলের জুড়ি মেলা ভার। এই তিলে রয়েছে ম্যাগনেশিয়াম, যা উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। তাই রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে এই তেলে রান্না করা ভালো। সাদা তিলের তেলে একাধিক প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং খনিজ রয়েছে। তাই প্রতিদিনের খাবারে এই তেল ব্যবহার করলে শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। যাদের ক্যান্সারের কেমোথেরাপি নিতে হয়, তাদের খাদ্য তালিকায় এই তেল রাখার কথা বলেন পুষ্টিবিদরা।

এই তেল হাড় মজবুত করে। তিলের তেলে রয়েছে তামা, যা গাঁটের ব্যথা, পা ফুলে যাওয়া, পেশিতে ব্যথা কিংবা বাতের ব্যথার উপশমে খুবই কার্যকর। যাদের আর্থারাইটিস বা গেঁটে বাতের সমস্যা আছে , তারা তিলের তেল দিয়ে রান্না করতে পারেন, উপকার পাবেন। তবে প্রত্যেকের শরীর ও তার সমস্যা আলাদা। তাই কোনো খাবার একজনের জন্য উপকারী হলেও অন্য কারো শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই যে কোনো খাবার ওষুধ বা পথ্য হিসেবে খেতে হলে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

## শরীর ভালো রাখে জামরুল

২৮/৬৩

গ্রীষ্মে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচুসহ লোভনীয় সব ফলের সঙ্গে পাওয়া যায় জামরুল। রসালো হলেও এই ফল আম বা লিচুর মতো তেমন জনপ্রিয় নয়। তবে এই ফল যে স্বাস্থ্যকর এ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের কোনো দ্বিমত নেই। জামরুল শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। ১০০ গ্রাম জামরুলে ২২ মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন সি মেলে। এমনকি প্রতি ১০০ গ্রাম জামরুল থেকে ২৯ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়ামও পাওয়া যায়, যা হাড় ও দাঁতের স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

জামরুলে আছে জামবোসিন, যা আমাদের রক্তে স্টার্চ থেকে শর্করা তৈরির প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। এ কারণে চিকিৎসকরাও ডায়াবেটিস রোগীদের জামরুল খাওয়ার পরামর্শ দেন। জামরুলে ফাইবার বা আঁশের পরিমাণ বেশি থাকায় খাবার হজম করতে সুবিধা হয়। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যাও কমে। এমনকি ওজন কমাতেও সাহায্য করে রসালো এই ফল।

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা - ৭০০ ০৪২ । দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১ ১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, রূপায়ণ : অভিজিত দাস
সম্পাদক : সুব্রত কুণ্ডু